সঙ্ঘমিত্রকে একখণ্ড ভূমি দান করেছিলেন। আসরফপুরের অন্য একটি দানপত্রে রাজরাজ কর্তৃক অনুরূপ দানের উল্লেখ আছে। এই দানপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একাধিক কর্মচারি বৌদ্ধ ছিলেন। রাতবংশের শ্রীধরন বুদ্ধের উপাসনার জন্য জমি দান করেছিলেন। কৈলান তাম্রপট্টে তার উল্লেখ আছে। অনন্তদেবের পুত্র, রাজা ভবদেব একটি তাম্রপট্টে (যা ময়নামতীর দক্ষিণে দেব পর্বতে পাওয়া গেছে) স্থানীয় বিহারকে ভূমি দান করেছিলেন। এই দানপত্রে রাজা ভবদেবকে "পরমসৌগত" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কুমিল্লার নিকটবর্তী শালবন বিহারে এই রাজবংশের অনুরূপ দুইটি দানপত্র পাওয়া গেছে। ভবদেবের অল্পকাল পরে সমতটে পালদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

পালগণ ঃ সূচনা

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল রাজাদের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। পাল রাজাগণ প্রায় চার শতাব্দী বাঙলা শাসন করেছিলেন। এই রাজাদের ক্রম পারম্পর্য এবং সন তারিখ প্রায় নিশ্চিত বলা চলে।

ধর্মপালের রাজত্বের বত্রিশতম বৎসরে প্রচারিত খলিমপুর তাম্রপট্ট থেকে জানা যায় যে শশাঙ্কর মৃত্যুর পর থেকে বাঙলায় মাৎস্যন্যায় চলছিল এবং প্রকৃতিগণ গোপালকে রাজপদে নির্বাচিত করেছিলেন। ডঃ মজুমদার এই ঘটনাকে নীরক্ত বিপ্লব আখ্যা দিয়েছেন এবং তাকে ১৮৬৭ সালের জাপানের ইতিহাসে সম্রাটের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে 'প্রকৃতি' শব্দের অর্থ জনগণ। কিন্তু তারা এই নির্বাচনে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল, এমন মনে হয় না। সাধারণ ভাবে মনে করা হয় যে নেতৃবৃন্দ এই নির্বাচন করেছিলেন এবং জনগণ হয়ত তা অনুমোদন করেছিল। ডঃ বি. এন. মুখোপাধ্যায় মনে করেন যে 'প্রকৃতি' শব্দের ভিন্নতর ব্যাখ্যা হতে পারে। তিনি দেখিয়েছেন যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে এর অর্থ হচ্ছে স্বামী (রাজা), অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোশ, দণ্ড (বল বা সেনা) এবং মিত্র। সুতরাং এই সাতটি শ্রেণীর তিন বা ততোধিক ব্যক্তি বা এই শ্রেণীগুলির তিনটির কিছু ব্যক্তি গোপালকে রাজ্যলাভে সাহায্য করে থাকতে পারে।

সমকালীন রীতি অনুসারে পৌরাণিক বংশ মর্যাদার দাবি পাল রাজারা করেন নি। খলিমপুর লেখ-তে গোপালকে শুধু রপ্যটের পুত্র এবং দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র বলা হয়েছে। রামচরিতে এবং তারানাথের রচনায় পাল রাজাদের ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। এই বর্ণনা এই কারণে স্বাভাবিক যে, ভারতীয় আর্য ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিতে সব রাজাই ক্ষত্রিয়। ডঃ মজুমদার মনে করেন যে রাষ্ট্রকূট এবং কলচুরিগণের সঙ্গে পাল রাজাদের বিবাহ সম্পর্ক পরোক্ষভাবে তাঁদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণিত করে। আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পে পাল-বংশকে "দাসজীবিনঃ" বলা হয়েছে। আবুল ফজল তাঁদের "কায়স্থ" বলেছেন। সুতরাং মনে হয় যে তাঁরা উচ্চতর বংশ অথবা বর্ণসম্ভূত ছিলেন না।

পাল রাজাদের সবগুলি তাম্রপট্ট বুদ্ধের প্রতি আবাহন দিয়ে শুরু হয়েছে। বৌদ্ধ পরিবারে গোপালের জন্ম হয়েছিল, না তিনি পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তা বলা যায় না। সে যাই হোক, চারশ বছর ধরে পাল রাজসভা ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয় স্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পালদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা আছে। পাল রাজাদের প্রথম দুই শতাব্দীর বেশির ভাগ লেখ মগধ এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাওয়া গেছে। তাই অনেকে মনে করেন যে, তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল মগধে এবং পরে তাঁরা বঙ্গদেশ জয় করেছিলেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। কেননা রামচরিতে বরেন্দ্রীকে পালদের জনকভূমি বলা হয়েছে এবং গোয়ালিয়র লেখ-তে নাগভট্টের প্রতিপক্ষকে 'বঙ্গপতি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তারানাথের সাক্ষ্য অনুযায়ী গোপাল বঙ্গাল দেশে রাজত্বের সূচনা করেন। তাই মনে হয় যে পালদের পিতৃভূমি ছিল বরেন্দ্র এবং তাঁদের প্রথম রাজ্য স্থাপিত হয় বোধ হয় বঙ্গাল দেশে।

গোপাল সিংহাসন আরোহণের পর "কামকারী" সামন্তদের দমন করেন। তাঁর রাজ্য সীমা সঠিক জানা যায় না। তবে মনে হয় যে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের উপর তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। না হলে ধর্মপালের পক্ষে দিগ্বিজয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পাঞ্জাব পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব হত না। সম্ভবত তিনি ৭৫০-৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

গোপাল নিজে বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনি এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। খলিমপুর লেখ-তে তাঁকে "পরম সৌগত" বলা হয়েছে। তাঁর রাজত্বকালে জনৈক উপাসক ওদন্তপুরি বিহার নির্মাণ করেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত তাঁর সমসাময়িক ছিলেন।

ধর্মপাল (৭৭৫-৮১২ খৃষ্টাব্দ)

সিংহাসন আরোহণের পরই ধর্মপাল ত্রি-পক্ষীয় সংগ্রামে লিপ্ত হন। এই তিনটি পক্ষ ছিল, পালগণ, প্রতিহারগণ এবং রাষ্ট্রকূটগণ। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে চালুক্যগণের পরিবর্তে রাষ্ট্রকূটগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের প্রতিপক্ষ ছিল প্রতিহারগণ। তারা মালব-রাজপুতানায় তাদের শক্তি সংহত করে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছিল। প্রতিহাররাজ বৎসরাজের সাম্রাজ্যলিপ্সা ছিল পূর্বমুখী এবং ধর্মপালের, পশ্চিমমুখী। তখন উত্তর ভারতের আধিপত্য বিস্তারের প্রতীক ছিল কনৌজ অধিকার। এই অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে ধর্মপাল এবং বৎসরাজের মধ্যে সংগ্রাম তাই অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দীর্ঘস্থায়ী ত্রি-পক্ষীয় সংগ্রামের ক্রম পরম্পরা নির্ণয় করা কঠিন। তবে একথা বলা যায় যে, বৎসরাজ এবং ধর্মপালের মধ্যে প্রথম সংঘর্ষ হয়েছিল গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চলে এবং এই যুদ্ধে বৎসরাজ সম্পূর্ণ ভাবে জয়ী হয়ে ছিলেন। তবে এই জয়লাভের পরিপূর্ণ ফসল ঘরে তোলার সুযোগ বৎসরাজ পাননি। তার আগেই রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব তাঁকে পরাজিত করেন এবং তিনি রাজপুতানার মরুভূমিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ধ্রুব তখন দোয়াব পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে ধর্মপালকে পরাজিত করেন এবং দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান।

রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের হাতে বৎসরাজের পরাজয়ের ফলে পালদের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। গুর্জরগণ এই পরাজয়জনিত হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করার পূর্বে ধর্মপাল দিগ্বিজয়ে বের হতে পেরেছিলেন। ডঃ মজুমদার বলেছেন যে, রাষ্ট্রকূট অভিযানের ফলে ধর্মপালের ক্ষতির তুলনায় লাভই বেশি হয়েছিল। এর ফলে বৎসরাজের ক্ষমতা বিশেষ ভাবে খর্ব হয়েছিল, কিন্তু ধর্মপালের প্রভাব প্রতিপত্তির বিশেষ হেরফের হয়নি। ধ্রুব

একদিকে ধর্মপালকে প্রতিহারদের আতঙ্ক থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং অন্য দিকে বিধ্বস্ত উত্তর ভারতে ধর্মপালের উচ্চাশা পূরণের জন্য বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রেখে গিয়েছিলেন। ধর্মপাল এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে অনতিবিলম্বে নিজেকে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই প্রচেষ্টায় তাঁকে অনিবার্য ভাবে গুর্জরগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়েছিল।

ধর্মপালের উত্তর ভারত অভিযানের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় না। ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালের তাম্রপট্ট থেকে জানা যায় যে, তিনি মহোদয়ের অর্থাৎ কনৌজের অধীশ্বর হয়েছিলেন এবং কনৌজের সিংহাসন থেকে ইন্দ্রায়ুধকে বিতাড়িত করে তাঁর পরিবর্তে নিজের মনোনীত ব্যক্তি চক্রায়ুধকে সেখানে বসিয়েছিলেন। ধর্মপাল এক্ষেত্রে কৌটিল্য এবং মনুর নীতি অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের মতে দূরবর্তী অঞ্চলে রাজ্য জয়ের পর সেখানে প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠিত না করে, তার বদলে মনোনীত ব্যক্তির উপর শাসন ভার অর্পণ করা ভাল। কোন কোন ঐতিহাসিক সিয়ান প্রশস্তির উপর নির্ভর করে মনে করেন যে সমতট গোপাল বা ধর্মপালের অধীনে ছিল।

মুঙ্গের তাম্রপট্ট থেকে জানা যায় যে, ধর্মপাল এই অভিযানে কনৌজ অতিক্রম করে অগ্রসর হয়েছিলেন। এই তাম্রপট্টে বলা হয়েছে যে, এই অভিযানে ধর্মপালের অনুচরগণ কেদার এবং গোকর্ণ-তে ধর্মীয় আচার পালন করেছিলেন। কেদারের অবস্থান হিমালয়ের গাড়োয়াল অঞ্চলে। অনেকের মতে বোম্বাই প্রদেশের উত্তর কানাড়া জেলার অন্তর্গত গোকর্ণ নামক স্থানটি, এই গোকর্ণ। ডঃ মজুমদার এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তাহলে সমগ্র রাষ্ট্রকূট অধিকৃত বোম্বাই প্রদেশের মধ্য দিয়ে ধর্মপালের বিজয়াভিযান মেনে নিতে হয়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। ডঃ মজুমদার মনে করেন যে, গোকর্ণ-র অবস্থিতি হয়ত ছিল নেপালে।

উপরোক্ত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা খলিমপুর তাম্রপট্টে বর্ণিত দরবার দৃশ্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি। এই দরবারে বিভিন্ন নরপতিগণ কম্পিত এবং অবনত মস্তকে ধর্মপালের কনৌজ সম্পর্কিত ব্যবস্থা অনুমোদন করেছিলেন। ডঃ মজুমদার বলেছেন যে, সমকালীন তাম্রপট্টের এই স্পষ্ট বক্তব্যকে কোন মতেই অগ্রাহ্য করা চলে না। সুতরাং মেনে নিতে হয় যে, অল্প কালের জন্য হলেও, ধর্মপাল সমগ্র উত্তর ভারতের অধীশ্বর হয়েছিলেন।

খলিমপুর তাম্রপট্টে নরপতিদের সম্পর্কে বিভিন্ন রাজ্যের যে নামগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি হল ঃ গন্ধার (পশ্চিম পাঞ্জাব), মদ্র (মধ্য পাঞ্জাব), কীর, কুরু, মৎস্য (যথাক্রমে কাংড়া, থানেশ্বর এবং জয়পুর অঞ্চল), অবন্তি (মালব), যবন (সিন্ধু উপত্যকার ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য), যদু (পাঞ্জাবের সিংহপুর) এবং ভোজ (বেরার অথবা তার অংশ বিশেষ)।

এই রাজ্যগুলি সরাসরি ধর্মপালের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়নি। তাদের শাসকগণ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন মাত্র। কনৌজ রাজ্যের স্থান ছিল স্বতন্ত্র। ধর্মপালের সময় কনৌজ আর একবার "সাম্রাজ্যবাদের আসন এবং প্রতীকে" পরিণত হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় যে, ধর্মপালের সময় বাঙলা সাম্রাজ্য তিন অংশে বিভক্ত ছিল। এই সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল বঙ্গদেশ এবং বিহার। ধর্মপাল এই অঞ্চল প্রত্যক্ষ ভাবে শাসন করতেন।

কনৌজ ছিল তাঁর অধীন, কিন্তু প্রত্যক্ষ শাসন বহির্ভূত একটি অঞ্চল। আরও দূরে, পশ্চিমে এবং দক্ষিণে, পাঞ্জাবে পশ্চিমের পার্বত্য রাজ্যগুলিতে, রাজপুতানায়, মালবে এবং বেরারে অনেকগুলি সামন্ত রাজ্য ছিল। এই সামন্ত রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, সম্রাটের প্রতি অনুগত ছিল।

ধর্মপাল দীর্ঘকাল কনৌজ আপন অধিকারে রাখতে পারেন নি। বৎসরাজের পর দ্বিতীয় নাগভটের রাজত্বকালে গুর্জর শক্তির পুনরুত্থান ঘটে এবং তিনি পুনরায় কনৌজ অধিকার করেন। দ্বিতীয় নাগভটের ভয়ে ভীত হয়ে ধর্মপাল এবং চক্রায়ুধ উভয়েই রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু এই কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রয়োজনের সময় তাঁদের রক্ষা করতে পারেনি। উত্তর ভারতে তৃতীয় গোবিন্দর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে দ্বিতীয় নাগভট চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন থেকে অপসারিত করেন। প্রতিহার রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত হয়। ধর্মপাল তখন দ্বিতীয় নাগভটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। প্রতিহাররাজ ভোজের (৮৩৬-৮৮৫ খৃষ্টাব্দ) গোয়ালিয়র লেখ-তে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের স্মৃতি বিধৃত হয়ে আছে। এই লেখ-তে ধর্মপালকে "দুর্বার বৈরী" বলা হয়েছে। মনে হয় উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ মুঙ্গেরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পাল রাজাদের লেখ-তে এই যুদ্ধের কোন উল্লেখ নেই। তবে দ্বিতীয় নাগভট যে পাল সাম্রাজ্যের প্রায় কেন্দ্রস্থল, মুঙ্গের পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, তা থেকে নিশ্চিত বলা যায় যে, ধর্মপাল পরাজিত হয়েছিলেন।

ডঃ মজুমদার মনে করেন যে, ধর্মপালের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় নাগভটের সাফল্য একটি সাময়িক ঘটনা মাত্র। রাষ্ট্রকূটদের পুনরায় আক্রমণের ফলে দ্বিতীয় নাগভট বিপর্যস্ত হন এবং এর ফলে ধর্মপাল তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত একজন শক্তিশালী সম্রাট রূপে তাঁর শাসন অব্যাহত রাখেন। তাই ডঃ মজুমদার বলেছেন যে, ধর্মপাল বাঙলাকে যে সাম্রাজ্য গৌরব এবং সামরিক খ্যাতি দান করেছিলেন, তা পূর্বে অথবা পরে, কখনও সম্ভব হয়নি।

খলিমপুর এবং মুঙ্গের লেখ থেকে মনে হয় যে, ধর্মপালের যা কিছু কৃতিত্ব, তার গৌরব একান্ত ভাবে তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু ভাগলপুর লেখ এবং গৌরব মিশ্রের বাদাল প্রশস্তি থেকে মনে হয় যে, তাঁর সাফল্যের যোগ্য অংশীদার ছিলেন অনুজ বাকপাল এবং তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গর্গ।

ধর্মপাল তাঁর রাজত্ব সুন্দরভাবে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে, বাঙলার বাইরে, তাঁর কোন সাফল্যই অবশিষ্ট ছিল না। চক্রায়ুধের অপসারণ এবং তাঁর বহু সংখ্যক মিত্র রাজ্যের উপর দ্বিতীয় নাগভটের অধিকার স্থাপন, তাঁর রাজত্বের শেষ দিনগুলিকে মসীলিপ্ত করেছিল। উত্তর ভারতে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দর সফল অভিযানের ফলে, তাঁর খ্যাতি অবশ্যই ম্লান হয়েছিল। তিনি তৃতীয় গোবিন্দর সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এতে তাঁর দুর্বলতা সুপরিস্ফুট হয়েছিল। গুর্জরদের দুর্দিনের সুযোগ গ্রহণ করে তিনি তাদের রাজ্য আক্রমণ করেন নি। তাই গুর্জর শক্তির পুনরুত্থান ঘটলে দ্বিতীয় নাগভটের হাতে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।

ধর্মপাল রাষ্ট্রকূট বংশীয়া রন্নাদেবীকে বিবাহ করেন। অনেকের মতে রন্নাদেবী তৃতীয় গোবিন্দর কন্যা ছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর

ব্রাহ্মণ মন্ত্রী গর্গের কথা পূর্বে বলা হয়েছে। খলিমপুর লেখতে মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্মনের নাম পাওয়া যায়।

ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মগধের বিখ্যাত বিক্রমশিলা (ধর্মপালের অপর নাম) বিহার তিনি নির্মাণ করেন। সোমপুরি এবং ওদন্তপুরি বিহারের আংশিক কৃতিত্ব হয়ত তাঁর প্রাপ্য। কোন কোন লেখ-তে তাঁকে "পরম সৌগত" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁর তাম্রপট্টগুলিতে এবং পাহাড়পুরে প্রাপ্ত সিলসমূহে ধর্মচক্র প্রতীক পাওয়া গেছে। তাঁরা হয়ত তাঁর পারিবারিক দেবতা ছিলেন। প্রখ্যাত বৌদ্ধ লেখক হরিভদ্র তাঁর গুরু ছিলেন। হরিভদ্র ত্রৈকুটক বিহারে অভিসময়ালঙ্কার গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি নিজে বৌদ্ধ হলেও, ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ। এ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি ধর্মকে রাজনীতি থেকে দূরে রেখেছিলেন।

দেবপাল (৮১২-৮৫০ খৃষ্টাব্দ) এবং তাঁর পরবর্তী শাসকগণ

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল রাজা হন। প্রাপ্ত লেখগুলি থেকে মনে হয় তিনি শুধু সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখেন নি, এর সীমা প্রসারিত করেছিলেন। সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দাক্ষিণাত্যে তৃতীয় গোবিন্দর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট রাজ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিয়েছিল। রাষ্ট্রকূট রাজ প্রথম অমোঘবর্ষ ব্যক্তিগত ভাবে দুর্বল ছিলেন। প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভটের মৃত্যুর পর শান্তিকামী রামভদ্র রাজা হয়েছিলেন। মনে হয় দেবপাল এই অনুকূল পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ প্রচেষ্টার পিছনে আদর্শের অনুপ্রেরণাও ছিল। হর্ষবর্ধন-পরবর্তী রাষ্ট্রীয় আদর্শ ছিল "সকলোত্তরপথনাথ" হওয়া। দেবপালের এই আদর্শ রূপায়ণে সহায়ক হয়েছিলেন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দর্ভপাণি এবং তাঁর পৌত্র কেদার মিশ্র।

দেবপালের রাজত্বের সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক উপাদান বাদাল স্তম্ভ লেখ। এই লেখ-তে ধর্মপাল থেকে আরম্ভ করে চারজন পাল রাজার অধীন বংশপরম্পরায় পাঁচজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর প্রশস্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পূর্বোক্ত দর্ভপাণি এবং কেদার মিশ্রর সাফল্য সম্পর্কে এতে অতিরঞ্জিত বর্ণনা আছে। এতে বলা হয়েছে যে, দর্ভপাণির কূটনীতির ফলে দেবপাল হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত এবং পূর্বসাগর থেকে পশ্চিম সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র ভারত থেকে কর আদায় করতে পেরেছিলেন। এতে আরও বলা হয়েছে যে, কেদার মিশ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য দেবপাল উৎকলগণের উচ্ছেদ সাধন, হূণদের গর্বহরণ, দ্রাবিড় এবং গুর্জর নৃপতিদের ঔদ্ধত্যের অবসানের পর সমুদ্রমেখলা রাজ্য ভোগ করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আবদুল মোমিন চৌধুরী তাঁর অধুনা প্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ 'ডাইনাস্টিক হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল'-এ মন্তব্য করেছেন যে, এই প্রশস্তিতে উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের চিরাচরিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং একে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা সঙ্গত হবে না।

তবে এই দাবি একেবারে মিথ্যা বলে মনে হয় না। হিমালয়ের সানুদেশে হূণরাষ্ট্র এবং প্রাগজ্যোতিষ, কম্বোজ, উৎকল প্রভৃতি রাজ্য ধর্মপালের সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত ছিল। তাই দেবপালের পক্ষে এইসব রাজ্য জয়ের প্রয়াস স্বাভাবিক বলে মনে

হয়। দেবপালের নিজের দানপত্রেও দেখা যায় যে, তিনি তাঁর বিজয় পতাকা পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত বহন করেছিলেন।

প্রতিবেশী রাজ্য প্রাগজ্যোতিষ (আসাম) স্বেচ্ছায় দেবপালের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল। অনেকে মনে করেন যে, গৌড় এবং কামরূপের মধ্যে তখন মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল এবং এই দুইটি রাজ্য মিলিত ভাবে উৎকল আক্রমণ করেছিল। দেবপালের উৎকল বিজয়ে কোন ফাঁক ছিল না। তার পরে তিনি হয়ত হূণরাজ্য জয় করে কম্বোজের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। ডঃ চৌধুরী বলেছেন যে, পাঞ্জাবের শাহী রাজাদের কথা মনে রাখলে উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য জয়ের কাহিনী অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ডঃ মজুমদার বলেছেন যে, দেবপাল যুদ্ধ ও রক্তপাতের নীতি অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর দাবি হয়ত একেবারে মিথ্যা বাগাড়ম্বর ছিল না।

বাদাল স্তম্ভ লেখ-তে যে গুর্জরগণের কথা আছে, তাদের রাজা ছিলেন মিহিরভোজ অথবা প্রথম ভোজ। গোয়ালিয়র প্রশস্তিতে ভোজের জয়লাভের কথা আছে। এ বিষয়ে ডঃ চৌধুরী মনে করেন যে, তিনি হয়ত প্রথমে জয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু পরে দেবপাল তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, এই লেখ-এর 'দ্রাবিড়'গণ ছিল রাষ্ট্রকূটগণ এবং তাদের রাজা ছিলেন প্রথম অমোঘবর্ষ। মুঙ্গের তাম্রপট্টে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। এতে বলা হয়েছে যে, দেবপালের সাম্রাজ্য রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ডঃ মজুমদার এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন যে, দ্রাবিড় বলতে সাধারণত তামিলদের বোঝায়। সুতরাং তাঁর মতে দ্রাবিড় নাথ হচ্ছেন পাণ্ড্যরাজ্য শ্রীমার শ্রীবল্লভ। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় এই যুক্তিকে দুর্বল মনে করেন। সে যাই হোক, দেবপালের সময়ও বিজিত রাজারা নিজ নিজ রাজ্যে স্বাধীন বলে গণ্য হতেন, তবে দেবপালের সর্বময় আধিপত্য তাঁদের স্বীকার করতে হত।

দেবপালের খ্যাতি ভারতের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁর সমকালীন জাভা, সুমাত্রা এবং মালয় উপদ্বীপের রাজা ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশীয় বলপুত্রদেব। তিনি নালন্দার একটি বিহারে দানের উদ্দেশ্যে দেবপালের নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন। নালন্দার বৌদ্ধবিহার তখন আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র ছিল এবং এই বিহারের পৃষ্ঠপোষক রূপে পাল রাজাদের খ্যাতি সমগ্র বৌদ্ধজগতে বিস্তার লাভ করেছিল।

কয়েক জন আরব পর্যটক নবম শতাব্দীর মধ্য ভাগে ভারতে এসেছিলেন। এই প্রসঙ্গে সুলেমান, ইদ্রিসি এবং মাশুদির নাম উল্লেখযোগ্য। সুলেমান ৮৫১ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভারত পর্যটনের বিবরণ লিখেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে দেবপালের গভীর আস্থা ছিল। তিনি সোমপুর বিহার নির্মাণ এবং ত্রৈকুটক মন্দিরের সংস্কার সাধন করেন। তাঁর অধিকাংশ দানপত্রে বুদ্ধের আবাহন এবং ধর্মচক্র প্রতীক পাওয়া গেছে। পাটনার অদূরে প্রাপ্ত হিলসা লেখ-টি বৌদ্ধ তারা মূর্তির স্তম্ভমূলে খোদাই করা। বিহারের অন্তর্গত ঘোষ্রবনে প্রাপ্ত লেখ থেকে ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র ভিক্ষু বীরদেবের কথা জানা যায়।

ঘোষ্রবন বিহারবাসী এই বীরদেব কণিষ্ক বিহারে তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করে মহাবোধি দর্শনে গিয়েছিলেন। নালন্দা দানপত্রে উল্লিখিত বলপুত্রদেবের কাহিনী পূর্বে বলা হয়েছে।

দেবপালের মৃত্যুর অল্পকাল পরে পাল সাম্রাজ্যের অবনতির সূচনা হয় এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্ব শেষ হওয়ার সময় এই সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ে। ৮৫০-৯৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পালদের ইতিহাস এই ক্রমাবনতির ধারাবাহিক কাহিনী।

এতাবৎ প্রচলিত ধারণা অনুসারে দেবপালের পর প্রথম শূরপাল (৮৫০-৮৫৮) এবং তাঁর পরে প্রথম বিগ্রহপাল (৮৫৮-৮৬০ খৃষ্টাব্দ) রাজা হন। সম্প্রতি এই ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে। এখন বলা হয় যে দেবপালের অব্যবহিত পরবর্তী শাসক শূরপাল ছিলেন না, ছিলেন মহেন্দ্রপাল। তাঁর পরে রাজত্ব করেন শূরপাল এবং তাঁর পরে হয়ত বিগ্রহপাল।

মহেন্দ্রপালের অস্তিত্ব সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে। মহেন্দ্রপাল নামাঙ্কিত কিছু মূর্তি-লেখ বিহার এবং উত্তরবঙ্গে (পাহাড়পুর ও মাহীসন্তোষ) আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু এই মহেন্দ্রপালকে প্রতিহার ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল মনে করা হত। এবং সেই ভিত্তিতে পণ্ডিতগণ মনে করতেন যে পাল রাজা নারায়ণপালের আমলে প্রতিহার মহেন্দ্রপাল (৮৮৫-৯০৭/৮ খৃষ্টাব্দ) বিহার ও উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ দখল করেছিলেন। এখন পাল বংশীয় মহেন্দ্রপালের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ার ফলে এই সব লেখ-উক্ত মহেন্দ্রপালকে পাল বংশীয় বলে মনে করা যায়। সুতরাং বহু আলোচিত প্রতিহার মহেন্দ্রপালের বঙ্গ অধিকার সম্পর্কিত অনুমানের এখন আর কোন ভিত্তি নেই। (এই তথ্যটির জন্য লেখক ডঃ বি. এন. মুখার্জীর নিকট ঋণী।)

মহেন্দ্রপাল অন্তত ১৫ (পাঠান্তরে ১৯) বছর রাজত্ব করেন। সুতরাং দেবপালের পরে তাঁর রাজত্বকাল ছিল অন্তত ৮৫০-৮৬৫ খৃষ্টাব্দ। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তাঁর পরবর্তী পাল শাসকদের এতাবৎ চিহ্নিত রাজত্বের সময়সীমা পরিবর্তিত হবে। অর্থাৎ তাঁদের সময়সীমার উভয় দিকে ১৫ যোগ করতে হবে।

সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি তাম্রলেখ থেকে মনে হয় যে শূরপাল দেবপালের অন্যতম পুত্র ছিলেন। এতদিন শূরপাল এবং প্রথম বিগ্রহপাল অভিন্ন মনে করা হত। কিন্তু অধুনা তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত। প্রথম বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র নন, ভ্রাতুষ্পুত্র। ঠিক কোন অবস্থায় রাজ্যারোহণ নীতিতে এই পরিবর্তন ঘটেছিল জানা যায় না। প্রথম বিগ্রহপাল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। মাত্র দুই বৎসর রাজত্বের পর তিনি পুত্র নারায়ণপালের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। অন্যমত অনুসারে প্রথম বিগ্রহপাল রাজা হয়েছিলেন কিনা, বলা যায় না। সুতরাং তাঁর সম্পর্কিত তারিখের উল্লেখ না থাকাই সঙ্গত মনে হয়।

নারায়ণপাল (৮৭৫-৯৩২ খৃষ্টাব্দ) সাতান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি কোন উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন বলে জানা যায় না। বরং রাষ্ট্রকূট এবং প্রতিহারগণের লেখ থেকে তৎকালীন পাল রাজাদের দুর্বলতার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতিহাররাজ ভোজ পালদের বিরুদ্ধে শক্তিসমবায় গঠন এবং পালদের পরাজিত করেন।

নারায়ণপালের রাজত্বকালে কামরূপ এবং উৎকলের সঙ্গে পাল রাজাদের পূর্ব সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। কামরূপের রাজা হর্জর এবং তাঁর পুত্র বনমাল পালদের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করেন। উৎকলের শৈলোদ্ভব বংশের রাজা মাধববর্মা শ্রীনিবাস সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

নারায়ণপাল সঙ্কীর্ণ অর্থে বৌদ্ধ ছিলেন, বলা যায়। তাঁর একটি মাত্র তাম্রপট্টে ধর্মচক্র প্রতীক পাওয়া গেছে। তাঁর লেখসমূহে "পরম সৌগত" অভিধা ব্যবহৃত হয়নি। তিনি তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে কোন বিহার নির্মাণ করেন নি। এই সময়ের কোন বৌদ্ধ পণ্ডিতের কথাও জানা যায় না। তাঁর রাজত্বের সপ্তম বৎসরের গয়া লেখ-তে পুরুষোত্তমের আবাহন আছে। পুরুষোত্তমের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে "পুরুষোত্তম" বলতে বুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে। অনেকের মতে বিষ্ণুকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

নারায়ণপালের পর তাঁর পুত্র রাজ্যপাল (৯৩২-৯৬৭ খৃষ্টাব্দ) রাজা হন। সরকারি লেখগুলিতে তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজশাহীর নিকট ভাতুরিয়ায় প্রাপ্ত মন্ত্রী যশোদাসের লেখ-এর উল্লেখ করা যায়। তাঁর ৩৭তম রাজ্যাঙ্কের একটি লেখ সম্প্রতি পাওয়া গেছে। এর ফলে তাঁর রাজত্বের কাল সীমা ঈষৎ পরিবর্তিত হতে পারে। রাজ্যপালের পর রাজা হন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোপাল (৯৬৭-৯৮৭ খৃষ্টাব্দ)। এই দুইজন রাজার কয়েকটি লেখ মগধ এবং উত্তরবঙ্গে পাওয়া গেছে। তাই বলা যায় যে, তাঁদের সময় পাল সাম্রাজ্য অন্তত মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রতিহারগণের বিপর্যয়ের জন্য পালদের এই আপেক্ষিক উন্নতি সম্ভব হয়েছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিহার শক্তি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পাল রাজাদের বিপদের অবসান হয়নি। তখন উত্তর ভারতে বুন্দেলখন্দ অঞ্চলে চন্দেল্ল রাজবংশ এবং গোরক্ষপুর অঞ্চলে কলচুরি রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং পাল রাজাদের তাঁদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ডঃ মজুমদার লিখেছেন যে, রাজ্যপাল এবং তাঁর পরবর্তী দুইজন রাজার রাজত্বকালে চন্দেল্লরাজ যশোবর্মন এবং তাঁর পুত্র ধঙ্গের আক্রমণে বাঙলার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ এবং তাঁর পুত্র লক্ষণরাজও বাংলা আক্রমণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় গোপালের পরে দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (৯৮৭-৯৯২ খৃষ্টাব্দ) রাজা হন। ডঃ রায়চৌধুরী মনে করেন যে, দ্বিতীয় গোপাল অথবা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কম্বোজগণের আক্রমণের ফলে পাল শক্তি আর একবার বিপন্ন হয়েছিল। ডঃ মজুমদার বলেন যে, কম্বোজ আক্রমণের সপক্ষে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায় নি। তাঁর মতে পালদের অধীন কোন কম্বোজ সামন্ত নৃপতি পালদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

রাজ্যপালের লেখ-তে বুদ্ধের আবাহন অথবা ধর্মচক্র প্রতীক নেই। তাই মনে হয় যে, দেবপালের পরে বৌদ্ধধর্মের ঈষৎ অবনতি হয়েছিল। দ্বিতীয় গোপালের সময় এই ধর্ম পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর লেখ-তে বুদ্ধের আবাহন আবার ফিরে এসেছিল। তাঁর রাজত্বের প্রথম বৎসরের নালন্দা প্রস্তর মূর্তি লেখটি বৌদ্ধ দেবী বাগীশ্বরীর মূর্তির স্তম্ভমূলের উপর খোদিত। বুদ্ধগয়া লেখ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। জলিলপাড়া তাম্রপট্টে বুদ্ধের নামে দুইটি গ্রাম ব্রাহ্মণদের দান করা হয়েছিল। তাঁর রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে বিক্রমশিলা বিহারে অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার একটি অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল। প্রথম মহীপালের বাণগড় লেখ-তে তাঁর পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালকে "সৌগত" আখ্যা দেওয়া হয়েছে।